দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 DEC 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

হায়াত হোসেন
(অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব, চ্যান্সেলরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিশন একজন নিরপেক্ষ উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। অথচ এদিকটা উপাচার্যপন্থীরা না দেখার বা না পড়ার ভান করছেন (অবশ্য আমার বিশ্বাস তারা পুরো রিপোর্টটি এবং অভিযোগ করছেন যে, কমিশন শিবিরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।

প্রকাশ্যে বা পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করার নিয়ম বোধ হয় বিচারপতিদের আচরণবিধিতে নেই। তাই এতো নির্মম হলেও এ ধরনের অন্যায়-অপবাদ আজ তাকে হজম করতে হচ্ছে। কিন্তু সরকারের কি এ ব্যাপারে কিছু করার নেই? একজন বিচারপতির সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব কি সরকারের নয়? এ অবস্থা হলে বিচারপতিরা কি আর কোনদিন এ ধরনের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন? অথচ একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনই সবসময় সর্বাধিক নিরাপদ, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধ মেটানোর সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু রিপোর্ট পক্ষে গেলে ভালো; বিপক্ষে গেলে খারাপ এই যদি হয় আমাদের মানসিকতা, বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষদের, তাহলে এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

সমাধানের পথ কি?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। মহল বিশেষের অপপ্রচারের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা এবং বিশেষ করে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে জনমনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল বা হয়ে থাকতে পারে, আশা করি এই লেখাটি আংশিকভাবে হলেও সেই অস্পষ্টতা দূর করতে পেরেছে। তদন্ত কমিশন রিপোর্টে যে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও অন্যান্যের (যারা সাক্ষ্য দান করেছে) মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি, ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ৯০% সাক্ষীই স্বীকার করেছে যে, ধর্মঘট বিরোধীরা (চাকসু) কলা ভবনের গেট খুলতে গেলেই সংঘর্ষ শুরু হয়। উপাচার্যপন্থী অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক স্বীকার করেছেন যে, উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নিজেই এতোদিন শিবিরকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষকই বিশেষ করে উপাচার্যের সমর্থকগণ বলেছেন, এর সংশোধন হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ মোট সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে প্রায় ৭০%-এর বক্তব্যের মধ্যে উপরোক্ত মতামতগুলো প্রতিফলিত হয়।

আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। পরেরদিকে উপাচার্যের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে নির্লিপ্ত থাকতে বললেও সরকার প্রথমদিকে বেশ সক্রিয়ভাবেই সহযোগিতা করেছিলো যেমন ২২ ডিসেম্বর তারিখের সহিংস ঘটনার পরেরদিনই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় সাটেল ট্রেন থেকে এক সাথে ১০৪ জন ছাত্র শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং এক সপ্তাহব্যাপী অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পুলিশী তৎপরতা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। '৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'চাকসু' নির্বাচনের কিছুদিন আগে শিবির বিরোধী ছাত্রঐক্যের কর্মীরা নির্বাচনের আগে ক্যাম্পাসে অস্ত্র তল্লাশীর দাবীতে উপাচার্যকে একদিন একরাত অফিসে ঘেরাও করে রেখেও রাজী করাতে পারেননি। পরে শোনা যায়, শিবিরের সাথে উপাচার্যের এটাই বোঝাপড়া ছিল যে, শিবির শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করতে এবং হারতে রাজী আছে; কিন্তু অস্ত্র ছাড়তে বা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ হারাতে রাজী নয় এবং সেভাবেই সবকিছু হয়, যদিও নির্বাচনের জন্য পত্র-পত্রিকায় বাহবা কুড়ালেন উপাচার্য আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিন। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনে বিজয়ের পর একটি দিনের জন্যও 'চাকসু' ক্যাম্পাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেনি, একটি ছাত্রাবাসেও ইউনিয়নের অফিস কক্ষটির দখল শিবিরের হাত থেকে বুঝে নিতে পারেনি এবং 'চাকসু' ছাড়া একটি হল ইউনিয়নেরই অভিষেক অনুষ্ঠান হতে পারেনি, শুধু এ এফ রহমান হল ছাড়া যেখানে শিবির নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

তবে ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু একক বৃহত্তম সংগঠনই নয়, এদের নেতারা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সংগঠনের নেতাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক এবং ঐক্যবদ্ধ। সন্ত্রাসের ব্যাপারে অস্ত্রের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক দিকটিতে তারা বেশী জোর দেয় যে কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা একেবারে নেই বললেই চলে। এমনকি ২২ ডিসেম্বরের ঘটনায় কোন গুলী ব্যবহার হয়নি, ফারুকুজ্জামান নাকি মারা যায় লাঠির আঘাতে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়ংকর রকমের বন্দুক যুদ্ধ হরহামেশা লেগেই আছে এবং গত দু'তিন বছরে কত ছাত্র যে নিহত হয়েছে তা হিসেব করা মুশকিল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীলদের সার্থকতা এক জায়গাতেই এবং তাহলো পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে শিবিরকে সন্ত্রাসী হিসেবে নিন্দনীয় করে তোলা এবং এ ব্যাপারে আমার চেয়ে পরিশ্রম কেউ করেছে বলে মনে হয় না। ওদের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সাল থেকে বিচিত্রাসহ বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় দশটি প্রচ্ছদ কাহিনী, শ'-খানেক রিপোর্ট এবং তারও বেশী বিবৃতি লিখে ছাপিয়েছি এবং এ কারণেই তাদের 'হিট লিস্টে' দীর্ঘদিন আমিই এক নম্বর ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু আজ হতবাক হয়ে দেখি যাদের জন্যে এতো পরিশ্রম, এতো ত্যাগ তারাতো কম সুযোগ সন্ধানী নয়। এমনকি প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীও যদি তাদের দিকে কিছু হালুয়া-রুটি ছুঁড়ে দিতেন ঘটনাটি হতে, ঠিক আজকে যেমন হচ্ছে- তখন নীতি আর আদর্শ সুবিধাবাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে তারাই এখন প্রগতিশীল হয়ে যায় আর যারা নীতি আঁকড়ে পড়ে থাকে এবং আপোস করে না তারাই মৌলবাদের দোসর হয়ে যায়।

তবে এটা ঠিক যে, গত বছর ধরে আমরা শিবিরকে ক্যাম্পাস থেকে যেভাবে উৎখাত করার চেষ্টা করেছি সেভাবে এটা আর সম্ভব নয়। বাইর থেকে মাস্তান এনে, পুলিশ, বিডিআর দিয়ে বা উপাচার্যকে ব্যবহার করে এটা করা যাবে না। এর জন্য চাই অন্যান্য সংগঠনগুলোর নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও আদর্শের প্রচার। নৈতিক শক্তিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২২ ডিসেম্বর নাকি শিবিরের ছিল শ'দেড়েক কর্মী আর তাদের বিপক্ষে হাজার তিনেক ছাত্র। অথচ সংঘর্ষ শুরু না হতেই 'চাকসু'পন্থীরা পশ্চাদপসরণ করে এবং পত্রিকার খবরানুযায়ী চাকসু ভিপি নাজিমুদ্দিন নিজেই নাকি মেয়েদের হলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ছাত্রদের উপদেশ পরামর্শ দেয়া যেতে পারে; কিন্তু মনের শক্তি জোগাবে কে?

যাই হোক, গত প্রায় এক বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে আছে। উপাচার্য নাকি আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্যাম্পাস একটু শান্ত হলেই তিনি পদত্যাগ করবেন যাতে কেউ বলতে না পারে তিনি সন্ত্রাসের কাছে মাথানত করেছেন। এর ফলে ১৪ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত স্থানীয় মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে ক্যাম্পাস শান্ত রাখা হয়; কিন্তু উপাচার্য পদত্যাগ না করে ১ জুন হঠাৎ ক্যাম্পাস থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সপরিবারে। এরপর আরো একবার একই ধরনের আশ্বাসের ফলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের জন্য অর্থাৎ ১৬ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করেন; কিন্তু এবারো তিনি পদত্যাগ করেননি এবং ইতিমধ্যে তাঁকে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে একবার শো-কজ নোটিশও দেয়া হয়। শোনা যায় প্রেসিডেন্ট/চ্যান্সেলর এরপর উপাচার্যকে বাংলাদেশ সংবিধানের বিশেষ ধারা বলে অপসারণ করার মনস্থির করেন। তবে এতে বাধ সাধেন কিছু বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রী। তবে সম্প্রতি উপাচার্য পরিবারের একাত্তরের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় ঐ নেতা-নেত্রীদের মতামতও পরিবর্তন হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে একাত্তরকে মূলধন করে উপাচার্য এখন উল্টো বিএনপি নেতৃত্বের মন জয় করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন বলে জানা যায়। এতে অবশ্য অনেকেই নরম হয়ে পড়লেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মন এখনো গলেনি বলে জানা যায়। শত হলেও বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে হরতালসহ আরো অনেক সরকার বিরোধী তৎপরতায় উপাচার্য যেভাবে ইন্ধন যুগিয়েছেন তা হয়তো প্রধানমন্ত্রী এতো সহজে ভোলেননি।

তবে সব কথার শেষ কথা জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজারো রকমের মতামত বা দল মত থাকবে। তারপরও সভ্যতার বাহন হিসেবে এর সুষ্ঠু লালনে আমাদের সবার যত্নবান হতে হবে। তা না হলে এ দেশ, সমাজ সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা পেছাতেই থাকব। আজ আশেপাশের সব দেশে শিক্ষার হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অথচ আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেখানেই আছি। তাই বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য নীচের প্রস্তাবগুলো রাখছি।

প্রস্তাবাবলী

১। মৌলবাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর সময় ও বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিনের প্রথম এক-দেড় বছরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছাত্র ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যে সীমাহীন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে তাতে তাদের সঞ্চিত শক্তির ভিত এখনো মজবুত রয়ে গেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সর্বাগ্রে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের যে কোন বিষয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশী। শিক্ষক ও ছাত্রগণ অনেকদিন থেকে এ দাবী জানিয়ে আসছেন; কিন্তু এখনো কোন সুফল পাওয়া যায়নি। এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী।

২। উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের পর একজন উপাচার্যকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ এবং আইনের প্রশ্নে কঠোর হতে হবে। কেননা, অপরাধী বা সন্ত্রাসীরা একবার প্রশ্রয় পেলে তাদের মধ্যে বার বার আইন ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

পদত্যাগের পূর্বমুহূর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রচন্ড জনমতের চাপে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রথম সারির দশজন সন্ত্রাসীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিলেও বর্তমান উপাচার্য সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর না করায় শিবিরের দাপট যে ক্যাম্পাসে বহুগুণ বেড়ে যায় সে ব্যাপারে আজ সবাই একমত। তখন উপাচার্য পদ প্রাপ্তির ব্যাপারে জামায়াত-শিবির ও মন্ত্রী আনিস-বাবলুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর কারণেই এটা হয়েছে বলে সবার নিশ্চিত ধারণা; কিন্তু ঘটনাটি যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এখন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাউকে ক্ষমা করতে হলে অবশ্যই ডিসিপ্লিন কমিটি ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে করতে হবে, উপাচার্যের একক সিদ্ধান্তে নয়।

৩। উপাচার্যের মত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন পদে নিযুক্তির পূর্বে একজন ব্যক্তির যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সরকারের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। দেখা যায় বিগত স্বৈরাচারী সরকার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত প্যানেলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেননি, যে কারণে ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবু ইমামদের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ কোন সময় এ পদ অলংকৃত করতে পারেননি। তাছাড়া যাঁকে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বা যিনি সিন্ডিকেট কর্তৃক তিরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন এমন কোন শিক্ষককে এ পদে নিয়োগ করা মোটেই ঠিক নয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়ার জন্য এটিও একটি কারণ হিসেবে কেউ কেউ মূল্যায়ন করলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

৪। আঞ্চলিকতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কঠিন ব্যাধির আকার ধারণা করছে। --(ক্রমশঃ)